Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ হাবিবা আক্তার

রোলঃ 227021149

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ হাবিবা আক্তার

রোলঃ 227021149

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছাঃ হাবিবা আক্তার, আইডিঃ 227021149 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মোছা: হাবিবা আক্তার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

মোছাঃ হাবিবা আক্তার

আইডিঃ 227021149

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

Contents

ভূমিকা 5

ফিলিস্তিনের ভৌগোলিক অবস্থান 8

ফিলিস্তিনের পূর্ব ইতিহাস 9

মুসলিমদের কাছে ফিলিস্তিন কেন গুরুত্বপূর্ণঃ 10

- ইসরা ও মিরাজের ভূমি 10
- মুসলমানদের প্রথম কিবলা 10
- পৃথিবীর দ্বিতীয় মসজিদ 10
- বায়তুল মুকাদ্দাসে নামাজ আদায়ের বিশেষ ফজিলত 11
- বরকতময় ভূখণ্ড 11
- তৃতীয় সম্মানিত শহর ও ফজিলতপূর্ণ ভূমি 14
- ফিলিস্তিন সম্পর্কে নবী (সঃ) এর ভবিষ্যৎ বাণী 15
- ফিলিস্তিন হাশরের ময়দান 18
- দাজ্জালের শেষ পরিণতিস্থল 19
- দাজ্জালের পরিচয় 19
  - দাজ্জালের ফিতনাসমূহ ও তার অসারতা 19
  - দাজ্জালের আগমন 20
  - দাজ্জালের শেষ পরিণতি 21

ফিলিস্তিনের বর্তমান অবস্থায় মুসলিমদের করণীয় 23

- ১. ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়ানো 23
- ২. উম্মাহ হিসেবে দায়িত্বশীলতা 24
- ৩. দুয়া করাঃ 24

- ৪. গণ-সচেতনতা সৃষ্টি করা 25
- ৫. অন্যায়ের প্রতিবাদ করা 25
- ৬. পণ্য বয়কটের মাধ্যমে 25
- ৭. আর্থিক সহায়তা প্রদান 26
- ৮. ফিলিস্তিনিদের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার মাধ্যমে 27
- ৯. নিজেদের পুর্নগঠন ও ঐক্য হওয়া 27

তথ্যসূত্র 29

ভূমিকা

পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাস তথা মসজিদুল আকসা মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত। বাইতুল মুকাদ্দাস বা মসজিদে আকসা মুসলমানদের প্রথম কিবলা। মক্কা ও মদিনার পর জেরুসালেমের আল-আকসা মসজিদকে ইসলামের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পৃথিবীর ১৮০ কোটি মুসলমানের হূদয়ের স্পন্দন পবিত্র আল-আকসা। পবিত্র কোরআনে পবিত্র ভূমি বলে ফিলিস্তিন, সিরিয়া ও এর আশপাশের অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে যাকে একসময় শাম বলা হতো। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা মসজিদুল আকসার কথা তুলে ধরেছেন ; এখান থেকেই সংঘটিত হয়েছিলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মেরাজ। রাসুলুল্লাহ (সা.) মিরাজের রাতে মসজিদুল হারাম তথা কাবা শরিফ থেকে প্রথমে মসজিদুল আকসা তথা বাইতুল মুকাদ্দাস সফর করেন যাকে বলা হয় ইসরা। [১] প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মাদ (সা.) মিরাজ গমনের আগে এই মসজিদে সব নবী–রাসুলের ইমামতি করে নামাজ আদায় করেন যে কারণে তাঁকে ‘ইমামুল আম্বিয়া’ বা নবীদের ইমাম ও ‘সাইয়েদুল মুরসালিন’ বা ‘রাসুলদের সরদার’ বলা হয়। এখানে বহু নবী–রাসুলের পুণ্যময় স্মৃতি রয়েছে এর আশপাশে অনেক নবী–রাসুলের সমাধি রয়েছে। এটি দীর্ঘকালের ওহি অবতরণস্থল ইসলামের কেন্দ্র এবং ইসলামি সংস্কৃতির চারণভূমি ও ইসলাম প্রচারের লালনক্ষেত্র। ইসলাম ধর্মে এমন কিছু পবিত্র স্থান রয়েছে যার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং সম্মান রক্ষাকে মুসলমানরা তাদের ঈমানি দায়িত্ব মনে করে। মসজিদুল আকসা সেগুলোর একটি। ফিলিস্তিন এমন পবিত্র ভূমি যেখানে অসংখ্য নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন আল্লাহতাআলা।

আল আকসা মসজিদ মানে- কিবলি মসজিদ, ডোম অফ দ্য রক ও বুরাক মসজিদের স্বমন্বয়ঃ

কিবলি মসজিদঃ রূপালি-গম্বুজ বিশিষ্ট আল কিবলি মসজিদটি আল-আকসার দক্ষিণ প্রাচীরের দিকে এবং এটি এই প্রাঙ্গণে মুসলমানদের নির্মিত প্রথম ভবন।মুসলমানরা ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে যখন জেরুজালেমে প্রবেশ করে, তখন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর বিন আল-খাত্তাব এবং তার সঙ্গীরা মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন। তখন কিন্তু এলাকাটি অবহেলিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে মসজিটির যে কাঠামো

দেখা যায় তা প্রথম নির্মিত হয়েছিল উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের আমলে অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে।বেশ কয়েকবার ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মসজিদটি, যা পরে পুনঃনির্মাণ করা হয়। কয়েকবার সংস্কার কাজও করা হয়। এর শেষ সংস্কার কাজটি হয়েছিল অটোমান আমলে, সে সময়ে সুলতান সুলেমান মসজিদ প্রাঙ্গণের বেশ কয়েকটি সাইট পুনরুদ্ধার করেছিলেন এবং সেখানে কার্পেট ও নানা ধরনের লণ্ঠন স্থাপন করেছিলেন।বর্তমানে আল-কিবলি মসজিদের নয়টি প্রবেশপথ রয়েছে। পাথর ও মার্বেলযুক্ত স্তম্ভের কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে মসজিদটি। পাথরের স্তম্ভগুলো প্রাচীন, বিশ শতকের গোড়ার দিকে যে সংস্কার কাজ হয়েছিল তখন মার্বেলগুলো যুক্ত করা হয়।আশি মিটার দৈর্ঘ্য ও ৫৫ মিটার প্রস্থের এই মসজিদটিতে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারেন।

ডোম অফ দ্য রকঃ জেরুজালেমের বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ল্যান্ডমার্ক রয়েছে আল আকসায় এবং ইসলামিক যুগের প্রারম্ভিক পর্যায়ের ঐতিহাসিক স্থাপত্যের নিদর্শন সংরক্ষিত রয়েছে এই প্রাঙ্গণে।ধর্মীয় ভবন, বিভিন্ন ধরনের গম্বুজ, মিনার, স্তম্ভের ঐতিহাসিক কাঠামো ছাড়াও রয়েছে ৩০টি পানির উৎস, যার মধ্যে অজু করার জন্য ব্যবহৃত কূপও রয়েছে। ইসলামি স্থাপত্যের প্রাচীন নমুনার দেখা মেলে আল আকসায়। আল আকসার দেয়ালের অভ্যন্তরে রয়েছে মিম্বার। এবং মামলুক ও আইয়ুবী যুগের ঐতিহাসিক বিদ্যালয়ের নিদর্শনও আছে এখানে।

আরবি ভাষায়, ‘ডোম অফ দ্য রক’কে ‘কুব্বাত আল-সাখরা’ বলা হয় যেটি ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। মক্কার আগে মুসলিমরা এই স্থানকে কিবলা হিসেবে ব্যবহার করতেন অর্থাৎ এর দিকে ফিরেই নামাজ পড়তেন তারা।উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নির্দেশে ৬৯২ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয় অষ্টকোণ বিশিষ্ট এই স্থাপনা ‘ডোম অফ দ্য রক’। 'হারাম আল শরীফ' বা 'টেম্পল মাউন্টের' উপর অবস্থিত সোনালী গম্বুজটি ইসলামী স্থাপত্যের অন্যতম একটি নিদর্শন।এর মধ্যখানে রয়েছে একটি পাথর, যাকে কেন্দ্র করেই এই স্থাপনা নির্মিত। এজন্যই একে বলে 'কুব্বাত আল-সাখরা’ বা ডোম অফ দ্য রক (পাথরের গম্বুজ)।

বুরাক প্রাচীরঃ আল-আকসার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান হলো মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ওয়েস্টার্ন ওয়াল, যা আল-বুরাক প্রাচীর নামেও পরিচিত।মরোক্কোন গেট ও প্রফেট গেট বা বাব আল নাবি গেটের মাঝখানে রয়েছে

প্রাচীরটি এবং এই এলাকায় একটি ছোট মসজিদও রয়েছে যা বুরাক মসজিদ নামে পরিচিত, যেটা ১৩০৭ থেকে ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল।প্রায় ২০ মিটার লম্বা ও ৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের প্রাচীরটি নিয়ে মুসলিমদের বিশ্বাস -নবী মুহাম্মদ মিরাজে যাবার আগে আল-বুরাক নামে পরিচিত একটি ডানাওয়ালা ঘোড়ার মতো প্রাণীকে বেঁধে রেখেছিলেন এখানে।

ফিলিস্তিনের ভৌগোলিক অবস্থান

ভৌগোলিক দিক থেকে ফিলিস্তিন মধ্যপ্রাচ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ। ফিলিস্তিনের পূর্বে রয়েছে লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, জর্দান ও সৌদি আরব। পশ্চিমে আফ্রিকার আরব দেশ মিসর। এই পুরো অঞ্চল হলো তেলসমৃদ্ধ। আর উত্তর-পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, যার তীরে সাইপ্রাস, তুরস্ক, গ্রিসসহ অন্যান্য ইউরোপীয় দেশসমূহ অবস্থিত। ইউরোপ থেকে সড়কপথে আফ্রিকা যেতে হলে ফিলিস্তিনের উপর দিয়েই যেতে হবে। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশের সাথে সংযুক্ত এই দেশটি পৃথিবীর মানচিত্রে এক অনন্য মর্যাদার অধিকারী। এটাই ফিলিস্তিনের ভৌগোলিক অবস্থানের একমাত্র সুবিধা নয় এবং আরও সুবিধা আছে। ফিলিস্তিন একসঙ্গে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত। ফিলিস্তিনের দক্ষিণ অংশ ‘গালফ অব আকাবা’ বা আকাবা উপসাগরের সাথে সংযুক্ত। আকাবা উপসাগরের এক পাশে সৌদি আরব। অন্য পাশে মিসরের সিনাই উপত্যকা, যা সুয়েজ খাল পর্যন্ত বিস্তৃত। ইউরোপ ও এশিয়ার বাণিজ্যিক জাহাজগুলো প্রথমে লোহিত সাগরে আসে তারপর সুয়েজ খাল পার হয়ে ভূমধ্যসাগরে যায়। ইউরোপ ও এশিয়ার বাণিজ্যের মেরদ- সুয়েজ খাল ফিলিস্তিন থেকে মাত্র ২০০ কিলোমিটার দূরে। সে হিসেবে সুয়েজ খালে নজর রাখা কিংবা সুয়েজ খাল বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সাইপ্রাসের চেয়েও উত্তম জায়গা হলো ফিলিস্তিন। ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। আর জর্দান নদী ফিলিস্তিনের পূর্ব দিকে অবস্থিত, যা ফিলিস্তিন ও জর্দানের সীমান্তও। জর্দান নদী গোলান পর্বতমালা থেকে শুরু হয়ে সি অফ গ্যালিলিতে গিয়ে পড়ে, তারপর সেখান থেকে মৃত সাগর প্রবাহিত হয়। সি অফ গ্যালিলি পানযোগ্য পানির অনেক বড় উৎস।পৃথিবীর মানচিত্রের এই অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী এই দেশটির উপর পূর্ণ দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে ক্রমান্বয়ে গোটা পৃথিবীতে শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং ইহুদিদের ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের তথাকথিত শান্তির দূত (দাজ্জাল) এসে যাতে গোটা পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারে, এ লক্ষ্য সামনে রেখেই অগ্রসর হচ্ছে ইহুদিবাদী ইসরাইল। টার্গেট করেছে পবিত্র আল আকসা।

ফিলিস্তিনের পূর্ব ইতিহাস

পবিত্র এ ভূমিকে কেন্দ্র করে রয়েছে দীর্ঘ ভাঙ্গা গড়ার ইতিহাস। ৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে হযরত ওমর (রা.) এর খেলাফতের সময় মুসলমানগণ ফিলিস্তিন ও বায়তুল মোকাদ্দাস বিজয় করেন। এর পর ১০৯৬ সালে ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু হলে ১০৯৯ সালে খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা আল আকসা দখল করে নেয়। এর পর ১১৮৭ সালে সুলতান সালাহ উদ্দিন আইয়ুবী (রহ.) পুনরায় বায়তুল মোকাদ্দাসকে খ্রিস্টানদের কবল থেকে মুক্ত করেন। এর পর সাত শত বছর পর্যন্ত ইহুদি-খ্রিস্টান চক্র নানা চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করেও জেরুজালেমে প্রবেশ করতে পারেনি। ১৯১৭ সালে ইংরেজরা ফিলিস্তিনে অনুপ্রবেশ করে এবং ১৯২০ সালে ফিলিস্তিনে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদিরা এই অন্যায় অনুপ্রবেশকে স্বীকৃতি দিয়ে ফিলিস্তিন ভূমিকে ইহুদি এবং মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেয়, যার ফলে ১৯৪৮ সালে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৭ সালে এই অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল পবিত্র আল আকসাকে জবর দখল করে নেয় এবং মুসলমানদের উপর জুলুম অত্যাচার চালাতে থাকে, যা আজ অবদি অব্যাহত আছে।

মুসলিমদের কাছে ফিলিস্তিন কেন গুরুত্বপূর্ণঃ

ইসরা ও মিরাজের ভূমি

জেরুসালেমের বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ইসরা বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাত্রিকালীন ভ্রমণের সূচনা হয়। যাকে মেরাজের ঘটনা বলা হয়। এই রাতে জিবরাঈল আলাইহিস সালামের সঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাত আসমান ভ্রমণ করেন, এই রাতেই তাকে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হয় এবং তিনি আল্লাহর সাক্ষাত লাভ করেন।

ফিলিস্তিনের বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে এই ভ্রমণ শুরু হয়। এখানে আল্লাহর রাসূল সব নবীর নামাজের ইমামতি করেন। তারপর তিনি এখান থেকে ঊর্ধ্ব আকাশে ভ্রমণ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি তার বান্দাকে রাত্রে ভ্রমণ করিয়েছিলেন আল-মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।'[২]

মুসলমানদের প্রথম কিবলা

ফিলিস্তিনের মসজিদুল আকসা হলো মুসলিমদের প্রথম কিবলা। যার দিকে মুখ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবিরা ১০ বছর নামাজ আদায় করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন, 'তুমি যেখান থেকে বাহির হওনা কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাকো না কেন ওর দিকে মুখ ফিরাবে।'[৩]

পৃথিবীর দ্বিতীয় মসজিদ

ইতিহাসে প্রথম নির্মিত মসজিদ মজসিদুল হারাম। এরপরের স্থানে আছে সুশোভিত প্রাচীনতম জেরুসালেম শহরে অবস্থিত মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ মসজিদে আকসা।

আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! দুনিয়াতে প্রথম কোন মসজিদটি নির্মিত হয়েছে? তিনি বলেন, মসজিদুল হারাম। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটি? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, তারপর হলো মসজিদুল আকসা। এরপর আমি জানতে চাইলাম যে, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কত বছরের? তিনি বললেন চল্লিশ বছরের ব্যবধান। [৪]

বায়তুল মুকাদ্দাসে নামাজ আদায়ের বিশেষ ফজিলত

বায়তুল মুকাদ্দাসে নামাজ আদায়ের বিশেষ ফজিলত রয়েছে। এ বিষয়ে এক হাদিসে হজরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘মসজিদে হারামে এক নামাজ এক লাখ নামাজের সমান, আমার মসজিদে (মসজিদে নববী) এক নামাজ এক হাজার নামাজের সমান এবং বাইতুল মাকদাসে এক নামাজ ৫০০ নামাজের সমান।’[৫]

বরকতময় ভূখণ্ড

পবিত্র কোরআনের ৫ স্থানে মহান আল্লাহ ফিলিস্তিনকে বরকতময়, পুণ্যময় ভূখণ্ড বলেছেন।

১. সুরা বনী ইসরাইলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন

سُبۡحٰنَ الَّذِیۡۤ اَسۡرٰی بِعَبۡدِہٖ لَیۡلًا مِّنَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ اِلَی الۡمَسۡجِدِ الۡاَقۡصَا الَّذِیۡ بٰرَکۡنَا حَوۡلَہٗ لِنُرِیَہٗ مِنۡ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّہٗ ہُوَ السَّمِیۡعُ الۡبَصِ ١

পবিত্র মহান সে সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে নিয়ে গিয়েছেন আল মাসজিদুল হারাম থেকে আল মাসজিদুল আকসা* পর্যন্ত, যার আশপাশে আমি বরকত দিয়েছি, যেন আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[৬]

উক্ত আয়াতে الۡاَقۡصَا দূরত্বকে বলা হয়।‘আল-বাইতুল মুকাদ্দাস’ বা ‘বাইতুল মাকদিস’ ফিলিস্তীন বা প্যালেষ্টাইনের কদস অথবা জেরুজালেম বা (পুরাতন নাম) ঈলীয়া শহরে অবস্থিত। মক্কা থেকে ক্বুদ্‌স চল্লিশ দিনের সফর। এই দিক দিয়ে মসজিদে হারামের তুলনায় বায়তুল মাকদিসকে ‘মাসজিদুল আকসা’ (দূরতম মসজিদ) বলা হয়েছে।

২. সাইয়িদুনা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনার সময় আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ نَجَّيۡنٰهُ وَ لُوۡطًا اِلَی الۡاَرۡضِ الَّتِیۡ بٰرَکۡنَا فِیۡهَا لِلۡعٰلَمِیۡنَ للعلمين

আর আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে সে দেশে নিয়ে গেলাম, যেখানে আমি বিশ্ববাসীর জন্য বরকত রেখেছি।[৭]

উক্ত আয়াত বেশির ভাগ ব্যাখ্যাতাগণের নিকট এ থেকে শাম (বর্তমানে সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন) দেশকে বুঝানো হয়েছে। যাকে শস্য-শ্যামলতা, ফলমূল, নদ-নদীর আধিক্য ও সেই সাথে বহু নবীর বাসস্থান হওয়ার কারণে বরকতময় ও কল্যাণময় বলা হয়েছে।

৩.মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনায়, যখন ফেরাউনের কবল থেকে মুসা আলাইহিস সালাম ও বনি ইসরাইলকে উদ্ধার করে আনা হয় এবং ফেরাউন ও তার সৈন্যদলকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ اَوۡرَثۡنَا الۡقَوۡمَ الَّذِیۡنَ کَانُوۡا یُسۡتَضۡعَفُوۡنَ مَشَارِقَ الۡاَرۡضِ وَ مَغَارِبَهَا الَّتِیۡ بٰرَکۡنَا فِیۡهَا ؕ وَ تَمَّتۡ کَلِمَتُ رَبِّکَ الۡحُسۡنٰی عَلٰی بَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ ۬ۙ بِمَا صَبَرُوۡا ؕ وَ دَمَّرۡنَا مَا کَانَ یَصۡنَعُ فِرۡعَوۡنُ وَ قَوۡمُهٗ وَ مَا کَانُوۡا یَعۡرِشُوۡنَ

'যে সম্প্রদায়কে দুর্বল মনে করা হত, তাদের আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি এবং বনি ইসরাইল সম্বন্ধে আপনার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হলো, যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিল।[৮]

উক্ত আয়াতে আর যমীনের মালিক বানিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে وَأَوْرَثْنَا শব্দটি ব্যবহার করে বলেছেন যে, তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়েছি। مَشَارِق শব্দটি مَشْرِق এর বহুবচন। আর مَغَارِب হচ্ছে مَغْرِب এর বহুবচন। শীত ও গ্রীষ্মের বিভিন্ন ঋতুতে যেহেতু সূর্যের উদয়াস্ত পরিবর্তিত হয়ে থাকে, সেহেতু এখানে মশারিক বা উদয়াচলসমূহ এবং মাগারিব বা অস্তাচলসমূহ বহুবচন জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর ভূমি ও যমীন বলতে এক্ষেত্রে অধিকাংশ মুফাসসিরনের মতে শাম বা সিরিয়া ও মিসর ভূমিকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে- যাতে আল্লাহ তা'আলা কওমে-ফিরআউন ও কওমে-আমালেকাকে ধ্বংস করার পর বনী-ইসরাঈলকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং শাসনক্ষমতা দান করেছিলেন।[৯]

এবং আয়াতের পরের রাজ্য বা দেশ বলতে শাম দেশের এলাকা ফিলিস্তীনকে বুঝানো হয়েছে। সেখানে মহান আল্লাহ আমালেকাদের পর বানী ইস্রাঈলকে বিজয়ী

করেন। মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ)-এর ইন্তিকালের পর বানী ইস্রাঈলরা শাম দেশে তখন গেলেন, যখন ইউশা' বিন নূন আমালেকাদেরকে পরাজিত করে বানী ইস্রাঈলদের জন্য রাস্তা সহজ করে দিলেন। আর দেশের ঐ অংশকে বরকত ও কল্যাণময় করলেন। অর্থাৎ, শাম (সিরিয়া ও ফিলিস্তীন) এলাকা; যেখানে অধিকাংশ নবীদের বাসস্থান ও সমাধিক্ষেত্র ছিল এবং বাহ্যিক সুন্দর শস্য-শ্যামলতাও আছে। অর্থাৎ বাহির ও ভিতর দুই দিক দিয়েই এই এলাকা ছিল সম্পদশালী। مشارق শব্দটি مشرق এর বহুবচন, অনুরূপ مغارب হল مغرب এর বহুবচন। যদিও পূর্ব-পশ্চিম একটিই হয়। বহুবচন পূর্ব ও পশ্চিমসমূহ থেকে উদ্দিষ্ট, দেশের বরকতময় পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত।

৪. হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের ঘটনায়। মহান আল্লাহ তাকে রাজ্য দান করেছিলেন এবং সবকিছুকে তার অধীনস্থ করে দিয়েছিলেন।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ لِسُلَیۡمٰنَ الرِّیۡحَ عَاصِفَۃً تَجۡرِیۡ بِاَمۡرِہٖۤ اِلَی الۡاَرۡضِ الَّتِیۡ بٰرَکۡنَا فِیۡہَا ؕ وَ کُنَّا بِکُلِّ شَیۡءٍ عٰلِمِیۡنَ

'আর সুলায়মানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম উদ্দাম বায়ুকে; সে তার আদেশক্রমে প্রবাহিত হত সেই ভূখণ্ডের দিকে যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি; প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমিই সম্যক অবগত।'[১০]

এই আয়াতে বরকত বা প্রভূত কল্যাণ রেখেছি বলে শাম দেশ তথা সিরিয়া, লেবানন ও ফিলিস্তিন এলাকাকেই বোঝানো হয়েছে। যার আলোচনা আগেই চলে গেছে।পাহাড় ও পাখিকে দাঊদ (আঃ)-এর অনুগত করে দেওয়া হয়েছিল, তেমনি হাওয়াকেও সুলাইমান (আঃ)-এর অনুগত করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তার পারিষদবর্গ সহ সিংহাসনে বসতেন এবং যেখানে ইচ্ছা করতেন এক মাসের রাস্তা মাত্র কয়েক ঘন্টায় পৌঁছে যেতেন। হাওয়া তাঁর সিংহাসনকে উড়িয়ে নিয়ে যেত। কল্যাণময় দেশ বলতে শাম (প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়া)-কে বুঝানো হয়েছে।

৫. সাবা-এর ঘটনায় আল্লাহ তাদের কীভাবে সুখ-শান্তিতে রেখেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ جَعَلۡنَا بَیۡنَہُمۡ وَ بَیۡنَ الۡقُرَی الَّتِیۡ بٰرَکۡنَا فِیۡہَا قُرًی ظَاہِرَۃً وَّ قَدَّرۡنَا فِیۡہَا السَّیۡرَ ؕ سِیۡرُوۡا فِیۡہَا لَیَالِیَ وَ اَیَّامًا اٰمِنِیۡنَ

'ওদের ও যেসব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং ওইসব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ

ব্যবস্থা করেছিলাম এবং ওদেরকে বলেছিলাম— 'তোমরা এসব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ কর দিনে ও রাতে।'[১১]

যে সব জনপদে আমি প্রাচুর্য দান করেছিলাম' বলে বরকতময় শাম দেশের জনপদকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আমি সাবা' (ইয়ামান) ও শামের মাঝে পথের ধারে ধারে বহু জনবসতি আবাদ করে রেখেছিলাম। অনেকে ظاهرة শব্দটির অর্থ মিলিত করেছেন। অর্থাৎ, এক অপরের সাথে মিলিত ও সংযুক্ত। তাফসীরবিদগণ সেই জনবসতির সংখ্যা চার হাজার সাত শত বলেছেন। এটাই তাদের ব্যবসার প্রধান রাস্তা ছিল, যার সংলগ্নে সাবা' থেকে শাম পর্যন্ত কাছাকাছি জনবসতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। যার ফলে প্রথমতঃ তাদের পানাহার ও আরাম করার জন্য পাথেয় সঙ্গে নেওয়ার প্রয়োজন হত না। দ্বিতীয়তঃ জনশূন্য হওয়ার ফলে পথে যে চুরি-ডাকাতি, লুট-মার ইত্যাদির আশঙ্কা থাকার কথা, তা ছিল না।

তৃতীয় সম্মানিত শহর ও ফজিলতপূর্ণ ভূমি

হাদিসের আলোকে প্রমাণিত যে তিনটি শহর সম্মানিত— মক্কা, মদিনা ও ফিলিস্তিন বা বায়তুল মুকাদ্দাস।

সহিহ বুখারিও মুসলিমে হজরত আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, '(ইবাদতের উদ্দেশ্যে) তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ভ্রমণ করা যাবে না। মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ ও মসজিদুল আকসা।'[১২]

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন সুলায়মান ইবনু দাউদ বায়তুল মাকদিসের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করলেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে তিনটি বিষয়ের প্রার্থনা করলেন। তার মতো শাসনক্ষমতা এবং এমন রাজত্ব, যা তার পরে কাউকে প্রদান করা হবে না ও সালাত আদায়ের একনিষ্ঠ মনে উক্ত মসজিদে আগমনকারীর পাপ মোচন করে তার জন্মের দিনের মতো নিষ্পাপ করার প্রার্থনা করেছেন।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ তার আবেদনের ভিত্তিতে তাকে দুটি প্রদান করেছেন। তৃতীয়টিও কবুল করবেন বলে প্রত্যাশা করছি।'[১৩]

ফিলিস্তিন সম্পর্কে নবী (সঃ) এর ভবিষ্যৎ বাণী

১.আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মতের একটি দল সত্যের ওপর বিজয়ী থাকবে। শত্রুর মনে পরাক্রমশালী থাকবে। দুর্ভিক্ষ ছাড়া কোনো বিরোধী পক্ষ তাদের কিছুই করতে পারবে না। আল্লাহর আদেশ তথা কেয়ামত পর্যন্ত তারা এমনই থাকবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তারা কোথায় থাকবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তারা বায়তুল মাকদিস এবং তার আশপাশে থাকবেন।'[১৪]

২. হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় সিরিয়া ও ইয়ামেন সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে দোয়া করেছেন-

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের শাম এবং ইয়ামেনে বরকত দান করুন।'

এ দোয়া শুনে উপস্থিত ব্যক্তিরা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের নজদেও বরকত দান করুন'- আপনি এ দোয়াও করুন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কথা না শোনে আবারও শাম এবং ইয়ামেনের জন্য বরকতের দোয়া করলেন। এভাবে তৃতীয়বারও লোকেরা নজদের জন্য দোয়া করতে বললেন, আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম ও দ্বিতীয় বারের মতো একই দোয়া করলেন।

তারপর রাসুলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নজদ; সে স্থানে তো ফেতনা-ফাসাদ হবে; সেখানে তো হত্যা, মারামারি হবে; খুনাখুনি হবে; সেখানে ভূমিকম্প দেখা দেবে এবং সেখান থেকে শয়তানের আবির্ভাব হবে।

এখানে নাজদ বলতে যে অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে, অধিকাংশ ইসলামিক স্কলার নাজদ বলতে ইরাককে বুঝিয়েছেন। কেননা নাজদ বলা হয় উঁচু অঞ্চলকে। আবার সৌদি আরবের হেজাজকেও নজদ বলা হয়। তবে কানজুল উম্মালের বর্ণনায় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজদ বলতে ইরাকের কথাই বলেছেন।

মূল কথা হলো-

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বরকত ও কল্যাণ চেয়েছেন শামবাসীর জন্য। সেহিসেবে শাম অঞ্চল বা সিরিয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও প্রিয় ভূখণ্ড।

৩. হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, ‘যখন তুমি দেখবে খেলাফত কোনো পবিত্র ভূমিতে অবতরণ করেছে বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন তুমি মনে করবে যে, কেয়ামত খুব সন্নিকটে এসে গেছে।’[১৫]

এ হাদিসে উল্লেখিত পবিত্র ভূমি সম্পর্কে হাদিস বিশারদগণ বলেছেন, ‘এ পবিত্র ভূমি বলতে শাম অঞ্চল বা সিরিয়া। উল্লেখিত হাদিসের পর্যালোচনা করলেই তা প্রমাণিত হয়ে যায়।

৪. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিরিয়াকে মুসলিম বিশ্বের হৃদপিণ্ড হিসেবে অভিহিত করেছেন বা মন্তব্য করেছেন।’ অর্থাৎ শামের লোকেরা যখন খারাপ হয়ে যাবে। মন্দ এবং খারাপ দিক যখন সিরিয়া বা শামের লোকদেরকে আক্রমণ করবে বা খারাপে পরিণত হবে; তখন তোমরা ধরে নেবে যে, পৃথিবীর কোনো অঞ্চল বা ভূখণ্ডে মুসলমানদের মধ্যে আর কোনো কল্যাণ অবশিষ্ট নেই।

অর্থাৎ হৃদপিণ্ডের মতো সিরিয়া বা শাম অঞ্চলের মানুষের মধ্যে যখন পছন ধরবে তখন পুরো দেহে তথা গোটা মুসলিম বিশ্বের পছন ধরে গেছে বলে মেনে নিতে হবে। এ হাদিসেও সিরিয়া বা শামদেশকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

৫. হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, একটা সময় আসবে যখন গোটা বিশ্বে বড় বড় যুদ্ধ দেখা দেবে তখন নওমুসলিমদের একটি দল আল্লাহর পক্ষে, সত্যের পক্ষে আল্লাহর দ্বীনের জন্য সংগ্রাম করতে থাকবে। ওই সময় আধুনিক যত অস্ত্র-শস্ত্র থাকতে তা নিয়েই তারা সজ্জিত থাকবে। আর সত্যের পক্ষে লড়াই করতে থাকবেন। [১৬]

সুতরাং চরম সংকটময় পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলার বিশেষ সাহায্য ও অনুগ্রহ পাওয়ার কথা ঘোষিত হয়েছে। আর তা আসবে সিরিয়া নামক দেশের দামেস্ক শহরে।

৬. হজরত নাওয়াস ইবনে সামআন রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার দাজ্জাল প্রসঙ্গে দীর্ঘ ও বিশদ আলোচনা করেছেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, কেয়ামতের আগে হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম যে আসমান থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। তিনি যে স্থানে অবতরণ

করবেন মূলত সিরিয়ার দামেস্ক নাম শহরে পূর্ব অঞ্চলে উঁচু এবং সাদা মিনারায়। তিনি অবতরণ করে দুনিয়াতে আসবেন এবং সারা দুনিয়ায় তাণ্ডব চালানো দাজ্জালের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করবেন। আর সিরিয়ার 'লুদ' নামক স্থানে তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন।' [১৭]

একজন মুসলমানের কাছে শাম অঞ্চল যে তাৎপর্যপূর্ণ তা পরিস্কারভাবে এ হাদিসের মাধ্যমে সুস্পষ্ট।

৭. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের আগে ইয়ামেনের হাজরামাউত নামক শহরে আগুনের তাপ দেখা দেবে, আগ্নেয়গিরি দেখা দেবে। আর সে আগুন মানুষকে ধাওয়া করতে থাকবে।

কেয়ামতের আগ মুহূর্তে সেই পরিস্থিতি আসলে করণীয় কী হবে? সে সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহাবায়ে কেরাম দিকনির্দেশনা চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন- 'তোমরা শামদেশ তথা সিরিয়ায় গিয়ে আশ্রয় নেবে।' হাদিসের অন্য বর্ণনায় বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন তিন (সিরিয়া, ইয়ামেন এবং ইরাকে) স্থানে এক সঙ্গে যুদ্ধ চলবে, তখন এক সাহাবি জানতে চাইলেন। হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে কোন পক্ষের হয়ে লড়াই করার নির্দেশ করবেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তুমি শামের হয়ে তথা সিরিয়ার হয়ে লড়াই করবে। যদি শামের পক্ষে লড়াই করার সামর্থ্য না থাকবে তবে ইয়ামেনের পক্ষে লড়াই করবে। এ হাদিস থেকে সুস্পষ্ট যে, শামের গুরুত্ব অনেক বেশি।

৮. কেয়ামতের আগে যে আগ্নেয়গিরি দেখা যাবে, যে আগুনের তাপ দেখা দেবে, সে আগুন মানুষকে ধাওয়া করতে থাকবে। সারা পৃথিবীর মানুষকে ধাওয়া করতে করতে থাকবে। মানুষকে ধাওয়া করতে করতে একটা সময় এক জায়গায় একত্রিত করবে। আর সেটি হলো সিরিয়া। পিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায়- 'আরদুল মাহশারে ওয়াল মানশার' অর্থাৎ সিরিয়াই হবে কেয়ামতের ময়দান। কেয়ামতের সময় মানুষ সারা পৃথিবী থেকে এসে এ শাম অঞ্চলেই একত্রিত হতে থাকবে। [১৮]

৯. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য হাদিসে ইরশাদ করেন, 'আল্লাহর ফেরেশতারা শাম অঞ্চলের উপরে তাদের ডানা বিছিয়ে দিয়ে আছেন। অথবা ডানা বিছিয়ে রাখবেন।'

১০. অন্য এক হাদিসে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্বপ্নে বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, 'একবার আমি শুয়েছিলাম। দেখলাম আমার মাথার নিচ থেকে আল্লাহর কিতাবকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। আর সেটাকে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন আমি তাকিয়ে দেখতে থাকলাম, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

দেখলাম একটা আলোকরশ্মি চলে যাচ্ছে। যেতে যেতে সেটা শাম অঞ্চল তথা সিরিয়ার ভূমি পর্যন্ত চলে গেল। আর সেটা সেখানেই অবতরণ করল। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যখন সারা পৃথিবীতে ফেতনা ফাসাদে ভরে যাবে তখন ঈমানের ঠিকানা হবে শাম বা সিরিয়া অঞ্চল আর ঈমানদারদের শেষ আশ্রয়স্থলও হবে শাম বা সিরিয়া অঞ্চল।

উল্লেখিত হাদিস থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, কেয়ামতের আগ মুহূর্তে পবিত্র নগরী মক্কা-মদিনা থেকেও ঘটনাবহুলস্থানে পরিণত হবে শামদেশ তথা- কুরআন-সুন্নাহর পরিভাষায়, সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন ও ফিলিস্তিন অঞ্চল। আর এ স্থানগুলো মর্যাদাও অনেক বেশি।

ফিলিস্তিন হাশরের ময়দান

মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের বায়তুল মাকদিস সম্পর্কে কিছু বলুন!'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'বায়তুল মাকদিস হলো হাশরের ময়দান। পুনরুত্থানের জায়গা। তোমরা তাতে গিয়ে সালাত আদায় করো। কেননা, তাতে এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করা অন্যান্য মসজিদে এক হাজার সালাত আদায়ের সওয়ার পাওয়া যায়।'

তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি মসজিদুল আকসাতে গমনের শক্তি-সামর্থ্য রাখেন না তার ব্যাপারে আপনার কী অভিমত?' তিনি বললেন, 'সে যেন তার জন্য জ্বালানি তেল হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করে। কেননা যে বায়তুল মাকদিসের জন্য হাদিয়া প্রেরণ করে, সে তাতে নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির মতো সওয়ার লাভ করবে।'[১৯]

দাজ্জালের শেষ পরিণতিস্থল

দাজ্জালের পরিচয়

দাজ্জাল মানব জাতিরই একজন হবে। মুসলমানদের কাছে তার পরিচয় তুলে ধরার জন্যে এবং তার ফিতনা থেকে তাদেরকে সতর্ক করার জন্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পরিচয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। মুমিন বান্দাগণ তাকে দেখে সহজেই চিনতে পারবে এবং তার ফিতনা থেকে নিরাপদে থাকবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার যে সমস্ত পরিচয় উল্লেখ করেছেন মু'মিনগণ তা পূর্ণ অবগত থাকবে। দাজ্জাল অন্যান্য মানুষের তুলনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের অধিকারী হবে। জাহেল-মূর্খ ও হতভাগ্য ব্যতীত কেউ দাজ্জালের ধোঁকায় পড়বেনা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালকে স্বপ্নে দেখে তার শারীরিক গঠনের বর্ণনাও প্রদান করেছেন। তিনি বলেনঃ দাজ্জাল হবে বৃহদাকার একজন যুবক পুরুষ, শরীরের রং হবে লাল, বেঁটে, মাথার চুল হবে কোঁকড়া, কপাল হবে উঁচু, বক্ষ হবে প্রশস্ত, চক্ষু হবে টেরা এবং আঙ্গুর ফলের মত উঁচু।[২০]

দাজ্জাল নির্বংশ হবে। তার কোন সন্তান থাকবেনা''।[২১]

দাজ্জালের ফিতনাসমূহ ও তার অসারতা

আদম সৃষ্টি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির জন্য দাজ্জালের চেয়ে বড় ফিতনা আর নেই। সে এমন অলৌকিক বিষয় দেখাবে যা দেখে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়বে। দাজ্জাল নিজেকে প্রভু ও আল্লাহ হিসেবে দাবী করবে। তার দাবীর পক্ষে এমন কিছু প্রমাণও উপস্থাপন করবে যে সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগেই সতর্ক করেছেন। মু'মিন বান্দাগণ এগুলো দেখে মিথ্যুক দাজ্জালকে সহজেই চিনতে পারবে এবং আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু দুর্বল ঈমানদার লোকেরা বিভ্রান্তিতে পড়ে ঈমান হারা হবে।

দাজ্জাল নিজেকে রাবব বা প্রভু হিসেবেও দাবী করবে। ঈমানদারের কাছে এ দাবীটি সুস্পষ্ট দিবালোকের মত মিথ্যা বলে প্রকাশিত হবে। দাজ্জাল তার দাবীর পক্ষে যত বড় অলৌকিক ঘটনাই পেশ করুক না কেন মুমিন ব্যক্তির কাছে এটি

সুস্পষ্ট হবে যে সে একজন অক্ষম মানুষ, পানাহার করে, নিদ্রা যায় এবং পেশাব-পায়খান করে। সর্বোপরি সে হবে অন্ধ। যার ভিতরে মানবীয় সব দোষ-গুণ বিদ্যমান সে কিভাবে রবব ও আল্লাহ হতে পারে!! একজন সত্যিকার মুমিনের বিশ্বাস হলোঃ মহান আল্লাহ সর্বপ্রকার মানবীয় দোষ-ত্রুটি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। কোন সৃষ্টজীবই তার মত নয়। আল্লাহকে দুনিয়ার জগতে কোন মানুষের পক্ষে দেখাও সম্ভব নয়।

দাজ্জালের আগমন

আখেরী যামানায় কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মিথ্যুক দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। দাজ্জালের আগমণ কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সবচেয়ে বড় আলামত। মানব জাতির জন্যে দাজ্জালের চেয়ে অধিক বড় বিপদ আর নেই। বিশেষ করে সে সময় যে সমস্ত মুমিন জীবিত থাকবে তাদের জন্য ঈমান নিয়ে টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। সমস্ত নবীই আপন উম্মাতকে দাজ্জালের ভয় দেখিয়েছেন। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও দাজ্জালের ফিতনা থেকে সতর্ক করেছেন এবং তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার উপায়ও বলে দিয়েছেন। ইবনে উমার (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেনঃ

قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّي لَأُنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ

“একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন। অতঃপর দাজ্জালের আলোচনা করতে গিয়ে বললেনঃ আমি তোমাদেরকে তার ফিতনা থেকে সাবধান করছি। সকল নবীই তাদের উম্মাতকে দাজ্জালের ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু আমি তোমাদের কাছে দাজ্জালের একটি পরিচয়ের কথা বলব যা কোন নবীই তাঁর উম্মাতকে বলেন নাই। তা হলো দাজ্জাল অন্ধ হবে। আর আমাদের মহান আল্লাহ অন্ধ নন। নাওয়াস বিন সামআন (রাঃ) বলেনঃ

ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ قَالَ فَانْصَرَفْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَيْهِ فَعَرَفَ ذَلِكَ فِينَا فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ قَالَ غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ لِي عَلَيْكُمْ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকাল বেলা আমাদের কাছে দাজ্জালের বর্ণনা করলেন। তিনি তার ফিতনাকে খুব বড় করে তুলে ধরলেন।

বর্ণনা শুনে আমরা মনে করলাম নিকটস্থ খেজুরের বাগানের পাশেই সে হয়ত অবস্থান করছে। আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর নিকট থেকে চলে গেলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা আবার তাঁর কাছে গেলাম। এবার তিনি আমাদের অবস্থা বুঝে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের কি হলো? আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যেভাবে দাজ্জালের আলোচনা করেছেন তা শুনে আমরা ভাবলাম হতে পারে সে খেজুরের বাগানের ভিতরেই রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ দাজ্জাল ছাড়া তোমাদের উপর আমার আরো ভয় রয়েছে। আমি তোমাদের মাঝে জীবিত থাকতেই যদি দাজ্জাল আগমণ করে তাহলে তোমাদেরকে ছাড়া আমি একাই তার বিরুদ্ধে ঝগড়া করবো। আর আমি চলে যাওয়ার পর যদি সে আগমণ করে তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেকে হেফাযত করবে। আর আমি চলে গেলে আল্লাহই প্রতিটি মুসলিমকে হেফাযতকারী হিসেবে যথেষ্ট”।[২২]

দাজ্জালের শেষ পরিণতি

সহীহ হাদীছের বিবরণ অনুযায়ী ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)এর হাতে দাজ্জাল নিহত হবে। বিস্তারিত বিবরণ এই যে, মক্কা-মদ্বীনা ব্যতীত পৃথিবীর সকল দেশেই সে প্রবেশ করবে। তার অনুসারীর সংখ্যা হবে প্রচুর। সমগ্র দুনিয়ায় তার ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে। সামান্য সংখ্যক মু’মিনই তার ফিতনা থেকে রেহাই পাবে। ঠিক সে সময় দামেস্ক শহরের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত এক মসজিদের সাদা মিনারের উপর ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। মুসলমানগণ তার পার্শ্বে একত্রিত হবে। তাদেরকে সাথে নিয়ে তিনি দাজ্জালের দিকে রওনা দিবেন। দাজ্জাল সে সময় বায়তুল মাকদিসের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। অতঃপর ঈসা (আঃ) ফিলিস্তীনের লুদ্দ শহরের গেইটে দাজ্জালকে পাকড়াও করবেন। ঈসা (আঃ)কে দেখে সে পানিতে লবন গলার ন্যায় গলতে শুরু করবে। ঈসা (আঃ) তাকে লক্ষ্য করে বলবেনঃ “তোমাকে আমি একটি আঘাত করবো যা থেকে তুমি কখনও রেহাই পাবেনা।” ঈসা (আঃ) তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করবেন। অতঃপর মুসলমানেরা তাঁর নেতৃত্বে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। মুসলমানদের হাতে দাজ্জালের বাহিনী ইহুদীর দল পরাজিত হবে। তারা কোথাও পালাবার স্থান পাবেনা। গাছের আড়ালে পালানোর চেষ্টা করলে গাছ বলবেঃ হে মুসলিম! আসো, আমার

পিছনে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে। আসো এবং তাকে হত্যা কর। পাথর বা দেয়ালের পিছনে পলায়ন করলে পাথর বা দেয়াল বলবেঃ হে মুসলিম! আমার পিছনে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে, আসো! তাকে হত্যা কর। তবে গারকাদ নামক গাছ ইহুদীদেরকে গোপন করার চেষ্টা করবে। কেননা সেটি ইহুদীদের বৃক্ষ বলে পরিচিত।[২৩]

ফিলিস্তিনের বর্তমান অবস্থায় মুসলিমদের করণীয়

পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিন আজ জালিমদের অত্যাচারে জর্জরিত, মুসলিমের রক্তে রঞ্জিত। বর্যমান সংকটে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম হিসেবে আমাদের অনেক কিছু করণীয় রয়েছে যা আমরা আল্লহর কিতাব এবং হাদিস থেকে শিক্ষা পাই। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু করণীয় হলোঃ

১. ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়ানো

ফিলিস্তিনবাসী চরম বর্বরতার শিকার। তাদের প্রতি অত্যাচারের মাত্রা এতটাই চরম পর্যায়ে পৌছেছে যে ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে তাদের প্রতি অত্যাচার দেখে গর্জে উঠেছে, চরম মর্মাহত হয়েছে। প্রত্যেক মুমিন মুসলিমের উচিত তাদের পাশে দাড়ানোর। যখন মক্কা নগরীতে কিছু দুর্বল মুসলিম রয়ে গিয়েছিলেন, যারা দৈহিক দুর্বলতা এবং আর্থিক অবস্থার জন্য হিজরত করতে পারছিলেম না, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মুসলিমদের নির্দেশ দেন নিপীড়িতদের সাহায্য করতে। কুরআনের ভাষায়ঃ

وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا.

(হে মুসলিমগণ!) তোমাদের জন্য এর কী বৈধতা আছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে সেই সকল অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য লড়াই করবে না, যারা দুআ করছে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে-যার অধিবাসীরা জালিম-অন্যত্র সরিয়ে নাও এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হতে একজন অভিভাবক বানিয়ে দাও এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হতে একজন সাহায্যকারী দাঁড় করিয়ে দাও? [২৪]

২. উম্মাহ হিসেবে দায়িত্বশীলতা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সুরা হুজুরাতে বলেছেন “ নিশ্চয়ই মুমিনরা একে অপরের ভাই”। এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ভাতৃত্ব সৃষ্টির কথা বলেছেন। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَه سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

পারস্পরিক ভালবাসা-সম্প্রীতি, দয়া-রহম, সহমর্মিতা ও সমব্যথী হওয়ার ক্ষেত্রে মুমিনদের দৃষ্টান্ত এক দেহের মতো, যার কোনো একটি অঙ্গ আক্রান্ত হলে বা অসুস্থ হলে পুরো দেহ নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে কাতর হয়।[২৫]

অন্য এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُه بَعْضًا.

মুমিনগণ পরস্পরে দেয়ালের মতো, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তি জোগায়।[২৬]

অপর এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُه وَلاَ يُسْلِمُه.

মুসলিমগণ একে অপরের ভাই, কোনো মুসলিম অপর ভাইয়ের ওপর জুলুম করতে পারে না, তাকে শত্রুর মোকাবেলায় সহায়তা না করে সঙ্গহীন একা ছেড়ে দিতে পারে না।[২৭]

৩. দুয়া করা

প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মুসলিমের উচিত সর্বদা দুয়ায় ফিলিস্তিনিদের স্মরম করা, বিশেষ করে দুয়া কবুলের মুহূর্ত গুলোতে যেমন, তাহাজ্জুদের সময়, নামাযের সিজদায়, কুনুতের দুয়ায়, প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর, , জুমুয়ার দিন আসর থেকে মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সুরা গফির এ বলেছেনঃ

“তোমাদের প্রতিপালক বলেন, ‘তোমারা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব”।

তিরমিযী শরীফের বর্ণনায় রসুলে কারীম সঃ বলেছেন, “ দুয়া হলো ইবাদাতের মুল”। তিরম্য়ী শরীফের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রসুল সঃ বলেছেন, “ দুয়া তাকদির পরিবর্তন করতে পারে”।

এছাড়াও সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স: বলেছেন, “ যখন কোনো মুসলিম তার ভাইয়ের জন্য অজান্তে দুয়া করে, তখন ফেরেশতারা বলে, ‘'আমিন! তোমার জন্য যেন এমন হয়’। এর অর্থ এই যে, আমরা ফিলিস্তিন ভাই-বোনদের জন্য দুয়া করলে ফিরিশতারাও আমাদের জন্য একই দুয়া করবে।

৪. গণ-সচেতনতা সৃষ্টি করা

বর্তমান স্যোসাল মিডিয়ার মাধ্যমে মুহুর্তের মধ্যে তথ্য পুরো বিশ্বে প্রচার-প্রসার হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আমরা ফিলিস্তিন বিষয়ে নির্ভরপ্যোয্য তথ্য ও ভিডিও শেয়ার করার মাধ্যমমে তাদের সাহায্য করতে পারি।

৫. অন্যায়ের প্রতিবাদ করা

প্রতিবাদ বিভিন্ন মাধ্যমে করা যেতে পারে। রাস্তায় বা মাঠে শান্তিপুর্ণ অবস্থানের মাধ্যমে, স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে সুসৃংখল প্রতিবাদ, সোস্যাল মডিয়ায় হ্যাশট্যাগ ব্যবহারের মাধ্যমে, ভূয়া প্রপাগান্ডা খন্ডন করে সত্য প্রচারের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে উদাহ্ন হিসেবে বলা যায়, ভিয়েতনাম আ আমেরিকা যুদ্ধ, যেখানে আমেরিকান দের প্রতিবাদে যুদ্ধে ইস্তফা এসেছিল, বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন, ইরাক যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদ (২০০৩), আরব বসন্ত (২০১০-২০১৩) ইত্যাদি। এছাড়াও আমরা ধর্ম-দল নির্বিশেষে সরকার ও বিভিন্ন সাহায্যকারী সংস্থার উপর চাপ প্রয়োগ সৃষ্টি করতে পারি।

৬. পণ্য বয়কটের মাধ্যমে

পণ্য বয়কটের বিভিন্ন প্রভাব রয়েছ্র। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ফিলিস্তিন পরিপন্থিদের পণ্য বয়কটের মাধ্যমে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা যেতে পারে, ফলে ওই কোম্পানির বিক্রি কমে তারা ক্ষতির মুখোমুখি হয়। এক্ষেত্রে বিকল্প পণ্য ব্যবহার করা যেতে

পারে।। রসুল স: নিজেও কুরাইশদের কিছু পণ্য বয়কট করেছিলেন, এবং কুরাইশ ও এক সময় মুসলিমদের তিন বছর শিয়াবে আবু তালিবে মুসলিমদের সাথে অর্থনৈতিক বয়কট করে। এ থেকে বুঝা যায়, পন্য বয়কট একটি কৌশলগত প্রতিরোধ, এতে হালাল পন্থায় জুলুমের জবাব দেওয়া যায়।এছাড়া মুসলিম হাদিসে আমরা পাই, " যে ব্যক্তি কোনো জালিমের বিরুদ্ধে অন্তত অন্তরে ঘৃণা পোষণ করলো, সে ঈমানের সর্বনিম্ন স্তরে আছে।" বয়কট অন্তত ঘৃণার প্রকাশ এবং ঈমানদারির প্রতীক। এছাড়াও প্রত্যেক মুসলিমের এ কথা স্মরনে রাখা উচিত, জালিমদের পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে তাদেরকে আরো বেশি জুলুমে সাহায্য করা হয়, নিরীহ ফিলিস্তিনির রক্ত ঝরাতে সাথায্য হয়। বয়কট একটি নিরস্ত্র জিহাদ। মহান আল্লাহ সুরাহ আল ইমরানে বলেন,

" তোমরা একে অপরকে সৎ কাজে র আদেশ দাও, অন্যায় থেকে বিরত রাখো.." এক্ষেত্রে বয়কট সেই 'নাহী অনিল মুনকার" অর্থ অন্যায় থেকে বিরত রাখার একটি উপায়।

৭. আর্থিক সহায়তা প্রদান

মানব সভ্যতায় আজ ফিলিস্থিনিদের প্রতি বর্বরতার চিহ্ন অবর্ণনীয়। প্রতি সেকেন্ডে মারা যাচ্ছে শত শিশু, বৃদ্ধ, অসহায় নারী। যারা আজ ঘপ্র-হারা, ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তাদের নেই কোনো বাসস্থান, নেই নিরাপত্রা,, নেই কোনো খাবার পানি। তাদের প্রতি জুলুমের চিত্র আজ দাগ কেটেছে তাদেরই এক শ্রেনীর মানবিক বিকবেকধারীর। প্রতিবাদ স্মরুপ অনেকে নিজের জীবন দিয়েছেম ক্ষুধায় জর্জরিত, ঘর বিহীন এসব ফিলিস্তিনিদের প্রতি আর্থিক সহায়তা সময়ের দাবি। যেমনটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সুরা ইনসানে বলেছেন,

"আর তারা আল্লাহর ভালোবাসায় দান করে অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দিদের।"

তাদের প্রতি আর্থিক সহায়তা প্রয়পজন তাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে, যাতে বোমায় আহত শিশু ও নারীর জন্য জরুরী ওষুধ, চিকিৎসার সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা যায়, তাদের ধ্বংসগ হওয়া ঘরবাড়ি পুনর্গঠনে, অবরোধের কারণে খাদ্য সংকটে থাকা ফিলিস্তিনিদের, বিশুদ্ধ পানির জন্য। এক্ষেত্রে দেশে বিদেশে বিভিন্ন সংস্থা

রয়েছেযারা ফিলিস্তিনে ফান্ড পাঠায়। আমরা আমাদের যাকাতের কিছু অংশ, মাসিক আয়ের কিছু অংশ নিয়মিত দিয়ে তাদের পাশে থাকতে পারি।

৮. ফিলিস্তিনিদের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার মাধ্যমে

ফিলিস্তিনিদের প্রকৃত ইতিহাত তুলে ধরা আজকের সময়ের একটি অতি গুরুত্বপূর্ন কাজ। দখলদার ইজরায়েলি শক্তি ও তাদের মিত্ররা বিশ্ববাসীর সামনে এক বিকৃত ও পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাস তুলে ধরেছে, যেখানে ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য দাবি ও দুঃখ ভোগান্তি আড়াল হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার মাধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব, কেননা ইতিহাস বিকৃত করে ইজরায়েল নিজেদের 'শিকার'' ও ফিলিস্তিনিদের ''সন্ত্রাসী'' হিসেবে তুলে ধরেছে। গণ সচেতনতার মাধ্যমে মানুষ ইতিহাস জানলে ভুল ধারণা ভাঙ্গে, সহানুভূতি গড়ে উঠে। বলা যায়, ইতিহাত তুলে ধরা একটি নৈতিক প্রতিরোধ, যা একটি অস্ত্র। এক্ষেত্রে আমরা নিজেদের এবং আন্তর্জাতিক ভাষায় কন্টেন্ট তৈরি করতে পারি, আলিমদের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। আজ ফিলিস্তিনিদের বলা হয় 'বন্দুকধারী হামাস', অথচ দখলদার ইজরায়েলী বাহিনীদের বলা হয় 'সেল্ফ ডিফেন্স'। প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার মাধ্যমে এই বিভ্রান্তি ভাঙ্গতে হবে।

৯. নিজেদের পুর্নগঠন ও ঐক্য হওয়া

প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের চরিত্র, দ্বিনদারী এবং ঐক্য জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে উম্মাহ হিসেবে বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব। মহান আল্লাহ সুরা আল ইমরানে বলেন,

"তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে কাঁকড়ে ধরো, এবং পরস্পরে বিভক্ত হয়ো না"

সুরা আম্বিয়ার ৯২ আয়াতে আল্লাহ বলেন,

"নিশ্চয়ই এই তোমাদেত উম্মাহ একক উম্মাহ, আর আমিই তোমাদের রব- সুতরাং আমার ইবাদাত করো"

এর মর্মাথ এই যে, মুসলমানদের জাতি, ভাষা, দেশ, দল, মাজহাব - এসব পার্থক্য বির্বিশেষে ঈমান ও উম্মাহর ভ্রাতৃত্বকে প্রাধান্য দিতে হবে।উম্মাহর দৃষ্টিভঙ্গিতে কথা

বলা ও চিন্তা করতে হবে, যুবকদের মাঝে ঐক্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, মতপার্থক্যের প্রতি সম্মান বজায় রেখে কৌশলী ঐল্য রাখতে হবে। চরিত্র গঠনেত মাধ্যমে শক্তিশালী উম্মাহ গড়ার ভিত্তি নির্মাণ সম্ভব। কেননা আজকের দুনিয়ায় মুসলমানদের চরিত্রই তাদের প্রকৃত ‘’ “ব্র্যান্ডিং”, যদি সেটি দুররল হয়, প্রতিরোধও দুর্বল হয়।

ফিলিস্তিন একটি ভূখন্ড নয়, এটি মুসলমানদের জন্য নিজেদের আত্নপরিচয়, ইতিহাস, রাজনীতি এবং দায়িত্ববোধের প্রতিক। পবিত্র আল-আকসা মসজিদেত উপস্থিতি, বহু নবীর স্মৃতিময় ভূমি হওয়া, এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম উম্মাহর আত্নিক ও রাজনীতিক সম্পর্ক এই ভুমির সাথে অটুটভাবে জড়িত।
ফিলিস্তিনের জনগণের উপর অব্যাহত নির্যাতন ও দমন নিছক রাজনৈতিক বিষয় নয়, বরং তা মানবতা ও ঈমাদের পরীক্ষাও বটে। মুসলিম উম্মাহ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, দোয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ করা, সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং ঐক্যবদ্ধভাবে নির্যাতির ভাই-বোনদের পাশে থাকা।
সারকথা, ফিলিস্তিনিদের প্রতি দায়িত্ব মুসলমানদের দায়িত্ব ও ভালোবাসা

তথ্যসূত্র

১] সুরা ইসরা (১৭) : ১

[২] সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত, ১

[৩] সূরা বাকারা (২) : ১৫০

[৪] সহিহ বুখারি: ৩১১৫

[৫] মাজমাউয যাওয়াইদ, ৪/১১

[৬]সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ০১

[৭] সূরা আম্বিয়া (২১) : ৭১

[৮] সূরা আরাফ (৭) : ১৩৭

[৯] ইবন কাসীর; সা'দী

[১০] সুরা আম্বিয়া (২১) : ৮১

[১১] সূরা সাবা, আয়াত, ১৮

[১২] মুসলিম, হাদিস, ৮২৭

[১৩] সুনানে ইবনু মাজাহ, হাদিস, ১৪৭৯

[১৪] মুসনাদে আহমদ: ২১২৮৬

[১৫] আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমাদ

[১৬] ইবনে মাজাহ

[১৭] মুসলিম

[১৮] মুসনাদে আহামদ

[১৯] মুসনাদে আহমদ, হাদিস, ২৬৩৪৩

[২০] বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান

[২১] মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান

[২২] তিরমিজী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান

[২৩] নেহায়া, আল-ফিতান ওয়াল মালাহিম, (১/১২৮-১২৯)

[২৪] সূরা নিসা (০৪) : ৭৫

[২৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৮৬

[২৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৮৫

[২৭] সহীহ বুখারী, হাদীস ২৪৪২